লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

সাধু ও চলিত ভাষা ঃ চলিত ভাষার উৎপত্তি ও প্রয়োগ রীতি

আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান*

১.০ বাঙলা ভাষায় উৎপত্তি

১.১ অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিদের মতে বাঙলা ভাষার জন্ম হয়েছে খ্রিষ্টীয় দশম শতকে। সে অনুযায়ী বাঙলা ভাষার বয়স প্রায় এক হাজার বছর। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পুরো পশ্চিবঙ্গ এবং উড়িষ্যা, বিহার, মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরা প্রদেশের অংশ বিশেষসহ বার্মার আরাকানী সম্প্রদায়ের ভাষা বাঙলা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙ্গালীর সংখ্যাসহ বাঙলাভাষীদের মোট সংখ্যা ধরা হয় প্রায় ৩০ কোটি। অর্থাৎ পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৬ শতাংশ লোক এ ভাষায় কথা বলে।

১.২ প্রায় ৩ হাজার বছরেরও পূর্বে ভারতবর্ষে আর্য-জাতির ভাষা ছিল 'আদি আর্য-ভাষা' বা বৈদিক' ভাষা। খ্রিষ্ট-পূর্ব অষ্টম শতকে পাণিনি ও তাঁর সঙ্গীবৃন্দ বৈদিক ভাষার কিঞ্চিৎ সংস্কার করে একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। বিধিবদ্ধ ও সংস্কারকৃত এই ভাষার নাম হয় 'সংস্কৃত ভাষা'। আর্য-জাতি নিজেদেরকে কুলীন মনে করতো এবং অনার্যদেরকে তাদের ভাষা ব্যবহার করতে দিতোনা। এমনকি আর্যদের মধ্যেও জাতি-ভেদ ছিল এবং নিম্ন স্তরের আর্যগণ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের অধিকার পেতোনা। তাছাড়া এটিকে ধর্মীয় ও পবিত্র ভাষা হিসেবেও গণ্য করা হতো। ফলে নিম্নশ্রেণীর আর্য-জাতি এবং অনার্যদের কথোপকথনে কতিপয় নতুন ভাষা জন্মলাভ করে, যার সাধারণ (common) নাম হয় 'প্রাকৃত ভাষা' বা 'মধ্য-আর্য-ভাষা'। 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ হলো 'নিম্নশ্রেণীভুক্ত বা অস্পৃশ্য'। নাম থেকে সহজে বোঝা যায় যে, প্রাকৃত ভাষা নিম্ন শ্রেণীর তথা সাধারণ জনগণের ভাষা ছিল। আবার কারও কারও মতে 'প্রাকৃত' শব্দটি 'প্রকৃতি' থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ 'স্বাভাবিক' বা 'স্বভাবসিদ্ধ'। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়েছিল। প্রায় এক হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষে নিজরূপে বিদ্যমান ছিল। কারও কারও মতে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৮ টির মত প্রাকৃত ভাষা বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে পালি, জৈন মাগধী, মহারাষ্ট্রী (মারহাট্টি), শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী ভাষা উল্লেখযোগ্য।

---

* উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১.৩ সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সুলিখিত ও ব্যাকরণ দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল। এই ভাষার বিভিন্ন শব্দের রূপ ও ধ্বনি পরিবর্তন করেই মূলত প্রাকৃত ভাষাশ্রেণী জন্ম লাভ করে। 'মাগধী' প্রাকৃত ভাষা পরে 'অপভ্রংশ' হিসেবে কিছুকাল বিরাজ করে; অতঃপর বাঙলা, বিহারি, আসামি (অহমিয়া) ও ওড়িয়া নামে চারটি আধুনিক ভাষার জন্মদান করে। অন্যান্য প্রাকৃত ভাষা থেকে সৃষ্ট হিন্দি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটী, রাজস্থানি, মারাঠি, সিংহলী, পশাই, উর্দু, কাফির, প্রভৃতি আধুনিক ভাষা অন্যতম। ভারত-বর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে অনার্য তথা দ্রাবিড় জাতি বাস করতো। এই জাতির ভাষা কালক্রমে তামিল, তেলেগু, তুলু, কানাড়ি, মালয়ালাম, ব্রাহুই, কুরুখ, কুই ও গোন্ডী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষাকেই ভারতবর্ষের আদি ও নিজস্ব ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২.০ বাঙলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

২.১ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাঙলা ভাষায় প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ শব্দই 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দ। বাকি ৫৫ শতাংশের মধ্যেও বিশাল এলাকা জুড়ে আছে সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বা তদ্ভব শব্দ। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা বিভিন্নভাবে বাঙলার ৭০ ভাগ শব্দ ভান্ডার দখল করে আছে।

২.২ প্রাচীন দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক জাতির কিছু ব্যবহৃত শব্দ, যা প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে অথবা সরাসরি বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করেছিল, সেগুলোকেই বাঙলা ভাষার আদিম এবং দেশী শব্দ বলে ধরা হয়। ভাষাবিদদের মতে এর সংখ্যা ৪০টির বেশী ছিলনা। তাই বলা যেতে পারে যে, ৪০টি নিজস্ব শব্দ সম্বল করে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার শব্দ ধার নিয়ে এবং সংস্কৃত ভাষা ভাণ্ডার ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে বাঙলা ভাষার সাম্রাজ্য; আজ যে ভাষার শব্দ সম্ভার একলক্ষ পঁচিশ হাজার বলে ধারণা করা হয়।

২.৩ বাঙলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও দেশী শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

কলা, কুলা, কামড়, খোকা, খুড়ী, খোঁপা (খোম্পা), খন্দ, গাড়ী, ঘোমটা, চাউল, চাঙারী, ছাল, ঝাড়, ঝাউ, ঝোপ, ঝাম্ভা, ঝানু, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙা, টোপর, ডাগর, ডাব, ডাহা, ডাঁসা, ডিঙগা, ঢেউ, ঢিল, ঢেঁকি, তেঁতুল, তামালী, নানা, নীহার, পেট, ফর্সা, মই, মকট, ইত্যাদি।

৩.০ বাঙলা ভাষার যুগ-বিভাগ

৩.১ বাঙলাভাষাকে কালের বিচারে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়। সেগুলো হলো ঃ

ক)	প্রাচীন যুগ	ঃ	জন্মলগ্ন থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ
খ)	মধ্যযুগ	ঃ	১২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ
গ)	আধুনিক যুগ	ঃ	১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত

৩.২ প্রাচীন যুগে বাঙলা ভাষা সুগঠিত ছিলনা এবং এর কোন গদ্যরূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। মূলত বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে 'বৌদ্ধগান ও দোহা' বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত পান বা কবিতার সংকলন। মধ্যযুগের প্রথমে হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের পদ্যরূপ প্রধান নিদর্শন বলে বিবেচিত। যেমন,

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, নারায়ণদেব-বিপ্রদাস-বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য প্রভৃতি। মধ্যযুগের শেষ দিকে ষোড়শ শতকে বাঙলাভাষার গদ্যরূপের নিদর্শন মেলে বিভিন্ন রাজাদেশ, পত্র, দলিল, হিতোপদেশ প্রভৃতিতে। ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর 'পুরোনো বাংলা গদ্য' নামক পুস্তকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, ১৪৫৯-১৫৬৮ সালে আসামের শংকর দেব বাঙলাভাষার গদ্যে 'পত্নীপ্রসাদ', 'রুক্মিনীহরণ', 'রামবিজয়' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। এর কিছুকাল পরে মাধব দেব 'ভোজনব্যবহার', 'চোর ধরা' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। আধুনিক যুগে বাঙলাভাষার গদ্যরূপের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মীর মোশারফ হোসেনের লেখা থেকে আরম্ভ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিম চন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক হাতে ভাষাটি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের দরবারে এ ভাষার জয়-ঝান্ডা উন্নীত করে তোলেন।

৪.০ বাঙলা ভাষার লিখিত ও কথ্য রূপ

৪.১ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় ভাব প্রকাশের দুটো রূপ প্রচলিত থাকে। একটি সাহিত্যের বা লেখ্য ভাষা, অপরটি দৈনন্দিন কথোপকথনের মৌখিক বা কথ্য ভাষা। লেখ্য ভাষা সর্বদাই ব্যকরণসম্মত এবং ভাষাগাম্ভীর্য দ্বারা আবৃত থাকে। কিন্তু মৌখিক বা কথ্য ভাষায় চটুল ও হালকা শব্দের প্রবণতা অধিকতর হয়। প্রায় সকল ভাষাই কালের বিবর্তনে মৌখিক বা কথ্য ভাষার কিছু শব্দ গ্রহণ করে লেখ্য ভাষাকে গতিশীল করে তোলে।

৪.২ বাঙলাভাষায় লেখ্য ভাষাকে সাধুভাষা এবং মৌখিক বা কথ্য ভাষাকে চলিত বা চল্‌তি ভাষা বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কেবল সাধু ভাষাকেই লেখ্য ভাষা হিসেবে গণ্য করা হতো। ঐ শতাব্দীর শেষাংশে দু' চারজন লেখক চলিত ভাষার শব্দাবলী লেখার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান, যা বৈয়াকরণবৃন্দের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। চলিত ভাষাকে লেখার অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি উপন্যাস ও গল্পের বর্ণনায় সাধুভাষা এবং কথোপকথনে চলিতভাষা সার্থকরূপে অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্যান্য লেখকদের ক্রমাগত প্রয়াসে বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিম-বঙ্গের চলিত শব্দাবলী (প্রধানত ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকা ও কলকাতা অঞ্চলের চলিত শব্দাবলী) লেখ্য ভাষা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে তাই বাঙলাভাষায় লেখ্য দুটো ভাষা পাওয়া যায়; একটি সাধুভাষা, অপরটি চলিত ভাষা।

৫.০ ক) সাধু ভাষার পরিচয়

৫.১ সাধু ভাষায় সাধারণত তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার বিদ্যমান থাকে এবং ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলো বেশী মাত্রায় প্রযোজ্য হয়। এ ভাষায় ক্রিয়া পদের পূর্ণরূপ (যেমন-খাইয়াছিলাম, পড়িয়াছিলে, চলিয়া, করিয়া প্রভৃতি), সর্বনামের পূর্ণরূপ (যেমন তাঁহারা, যাহারা, সেই দিকে, প্রভৃতি) এবং বিশেষ্য পদের মূল ও পূর্ণ বানান (যেমন-ইচ্ছা, হিসাব, সন্ধ্যা প্রভৃতি) অটুট থাকে। ভাষাটির একটি সহজ গাম্ভীর্য, সুষমা ও

আভিজাত্য আছে। অত্যন্ত ধীর লয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। সাধারণ কথ্য ও আঞ্চলিক শব্দ তেমন একটা এ ভাষায় স্থান পায় না।

খ) চলিত ভাষার পরিচয়

৫.২ চলিত ভাষা বাঙ্গালীর প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপ নগরী ও পরে কলকাতার মৌখিক বা কথ্য ভাষা থেকে মূলত জন্মলাভ করেছে। সাধু ভাষার ক্রিয়াপদগুলো অত্যন্ত প্রলম্বিত ছিলো, যা দৈনন্দিন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা কষ্টকর বিবেচিত হয়। ফলে ক্রিয়াপদগুলোকে সংকুচিত করে বাঙলা ভাষার লিখন সহজতর করতে গিয়ে চলিত ভাষা জন্ম নেয়।

৫.৩ বর্তমানে চলিত ভাষায় কেবল ক্রিয়াপদই নয়, বরঞ্চ সর্বনাম, বিশেষ্য, অব্যয় এবং বিশেষণ পদগুলোকেও সংক্ষিপ্ত করে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলিত ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, নতুন সৃষ্ট শব্দ, আঞ্চলিক মার্জিত শব্দ এবং শুদ্ধ বানানে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত শব্দকে সে স্থান করে দেয়। ফলে চলিত ভাষাকে চটুল গতিসম্পন্ন জীবন্ত ভাষা বলা হয়।

৫.৪ তাই বলে চলিত ভাষায় অশুদ্ধ বানান বিশিষ্ট এবং নিতান্তই আঞ্চলিক শব্দের (গল্প, উপন্যাস, নাটকে কথোপকথন ছাড়া) প্রবেশাধিকার এখনও স্বীকৃত নয়।

৬.০ সাধু ও চলিত ভাষার উদাহরণ

৬.১ সাধুভাষার উদাহরণ ঃ

"এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম বয়স যাহাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই—ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত—হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।"... (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্প থেকে গৃহীত)

৬.২ চলিত ভাষায় রূপান্তরঃ

"এ সেই বুড়ো সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাওর করতে পারলাম না। কিন্তু মুখের দিকে চাওয়ামাত্রই টের পেলাম, বয়স যাই হোক, খেটে খেটে আর রাত জেগে জেগে এর শরীরে আর কিছু নেই—ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা বাসি ফুলের মত—হাত দিয়ে একটু ছোঁয়া দিলে একটু নাড়াচাড়া করতে গেলেই ঝরে পড়বে।..."

৭.০ চলিত ভাষা উৎপত্তির কারণ

৭.১ বৈয়াকরণদের মতে বাঙ্গালীর সহজাত উচ্চারণ প্রবণতার কারণে শব্দের (বিশেষ করে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের) যে পরিবর্তন সাধিত হয়, কালক্রমে সেই 'ধ্বনি পরিবর্তন রীতি' অনুসারে চলিত শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে এবং চলিত ভাষা জন্ম নিয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে ধ্বনি পরিবর্তনই চলিত ভাষা উৎপত্তির মূল কারণ। তবে

পরিবর্তিত ধ্বনিরূপ যখন একেবারেই আঞ্চলিক হয়ে পড়ে, তখন চলিত ভাষা তাকে আর গ্রহণ করে না। সে কারণে চলিত শব্দের উৎপত্তিতে নবদ্বীপ নগরী, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকা ও কলকাতা শহরের ধ্বনি পরিবর্তন রীতি সিংহভাগ স্থান দখন করে থাকলেও রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম বা বরিশালের পরিবর্তিত ধ্বনি-রূপ চলিত ভাষার শব্দে স্থান লাভ করার তেমন একটা সুযোগ পায়নি। এ প্রবন্ধে 'ধ্বনি পরিবর্তন রীতি'র মূল কারণগুলো আলোচনা করা হবে, যাতে চলিত ভাষা উৎপত্তির কারণ অনুধাবন সম্ভব হয়।

ক) স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptixis বা Vowel Insertion)

৭.২ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে অনেক যুক্তবর্ণ আছে, যেগুলো দুটি বা তার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা গঠিত। যেমনঃ রত্ন, যত্ন, ধর্ম, জন্ম, বর্ষণ, ভ্রূ, ইত্যাদি। এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে মূলত কোন স্বরবর্ণ নেই কিন্তু সাধারণ লোকের উচ্চারণে কষ্ট হতো বলে তারা যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বরবর্ণ প্রবেশ করিয়ে সেগুলোকে উচ্চারণ করতে আরম্ভ করে। এভাবেই কালক্রমে ঐ সব শব্দ যথাক্রমে রতন, যতন, ধরম, জনম, বরিষণ, ভুরু ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে। এখন পরিবর্তিত শব্দগুলো (বানানসহ) চলিত ভাষার রূপ লাভ করেছে। এরূপ ইংরেজি শব্দ (ফিল্ম-ফিলিম, গ্লাস-গেলাস, ব্রাশ-বুরুশ), ফারসি শব্দ (মর্দ্-মরদ, মুল্ক্-মুলুক, সির্ফ্-সেরেফ/শ্রেফ, জখম্-জখম্), আরবি শব্দ (জবেহ্-জবাই) প্রভৃতিতে স্বরবর্ণ যুক্ত হয়েছে।

খ) স্বর-সঙ্গতি (Vowel Harmony)

৭.৩ বাঙলা ভাষার স্বরবর্ণগুলোর মধ্যে উচ্চ, উচ্চ-মধ্য, নিম্ন-মধ্য ও নিম্ন স্বরধ্বনির বিভাগ রয়েছে।

যেমন ঃ	উচ্চ স্বরধ্বনি	=	ই, ঈ, উ, ঊ
	উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি	=	এ, ও
	নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি	=	এ্যা, অ
	নিম্ন স্বরধ্বনি	=	আ

যখন একটি শব্দের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন স্বরধ্বনির অবস্থান থাকে, তখন বাঙ্গালী তার সহজাত উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় দুটো মাত্রার স্বরধ্বনির মধ্যে একটা স্বর সঙ্গতি বিধান করে উচ্চারণ করে। যেমন- 'ইচ্ছা' শব্দটির প্রথম মাত্রায় উচ্চ স্বরধ্বনি 'ই' আছে এবং দ্বিতীয় মাত্রায় 'চ্ছা' (আ) নিম্ন স্বরধ্বনি আছে। চলিত উচ্চারণে 'ই' ও 'আ' এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে (ই+এ) 'ইচ্ছে' শব্দ জন্ম নিয়েছে। তেমনিভাবে হিসাব-হিসেব, সন্ধ্যা-সন্ধ্যে প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে স্বর-সঙ্গতি বিশেষভাবে বিদ্যমান। যেমনঃ লিখা-লেখা, গিলা-গেলা, মিশা-মেশা, গুণা-গোণা, শুনা-শোনা প্রভৃতি চলিত ক্রিয়া পদ সৃষ্টির কারণ।

গ) অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি (Epenthesis and Vowel Mutation)

৭.৪ শব্দের মধ্যে ই-কার বা উ-কার থাকলে তাকে সেই বর্ণের পূর্বে 'ই' বা 'উ' বর্ণ বসিয়ে পূর্ণ রূপে উচ্চারণ করার একটা প্রবণতা বহু পূর্ব থেকেই বাঙলাভাষীদের মধ্যে

(বিভাষ করে পূর্ব বঙ্গে) বিদ্যমান আছে। যেমন 'রাখিয়া' শব্দটির 'খি' বর্ণের ই-কারকে পূর্ণ 'ই' বর্ণ হিসেবে পূর্বে বসিয়ে 'রাইখ্যা' এরূপ উচ্চারণ করা হয়। তেমনিভাবে 'চলিয়া'-চইল্যা, বলিয়া-বইল্যা, প্রভৃতি বাঙ্গালীর সহজাত উচ্চারণ। এরূপ উচ্চারণ ভঙ্গিকে 'অপিনিহিতি' বলা হয়। এই অপিনিহিতি যখন একটু মার্জিত রূপ গ্রহণ করে তখন সেই রূপকে 'অভিশ্রুতি' বলে।

যেমনঃ	মূল শব্দ	অপিনিহিতি	অভিশ্রুতি
	আজি	আইজ	আজ
	জালিয়া	জাইল্যা	জেলে
	রাতি	রাইত	রাত
	মাঝুয়া	মাউঝুয়া	মেঝো/মেজো
	চারি	চাইর	চার
	নড়িল	নইড়লো	নড়লো
	বলিব	বইলবো	বলবো
	ধরিল	ধইরলো	ধরলো
	করিয়া	কইর‍্যা	করে
	নাচিব	নাইচবো	নাচবো
	আসিয়া	আইস্যা	এসে

ঘ) 'র' ও 'হ' বর্ণ লোপ করার প্রবণতা (Tendency to Drop Internal 'R' and 'H')

৭.৫ বাঙ্গালীর বিশেষ করে কলকাতাবাসীদের মধ্যে শব্দের মধ্যস্থিত 'র' ও 'হ' লোপ করে উচ্চারণ করার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। এর ফলে তৎসম ও বিদেশি শব্দাবলীর মধ্যস্থিত 'র' কে বিলুপ্ত করে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব ঘটানো হয়। শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত 'হ' কে পূর্ণ লুপ্ত অথবা পরিবর্তে 'ই' ব্যবহার করার আধিক্যহেতু নতুন নতুন চলিত শব্দ জন্ম নিয়েছে। এখানে 'র' ও 'হ' বিলুপ্তকৃত কতিপয় শব্দের উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১। র-বর্ণ লোপ কৃত শব্দ

মূল শব্দ	চলিতে ব্যবহৃত শব্দ
গৃহিনী (গিরহিনী)	গিন্নী
কর্তা	কত্তা
মুর্খ	মুখ্যু
ধর্ণা (ধরণা)	ধন্না
ঠাকুরদাদা	ঠাকুদ্দা
সূর্য্য	সুজ্জি
কর্ম	কম্ম
শিরিনী (ফারসি)	শিন্নি
সরদার (")	সদ্দার
কুরনিশ (")	কুন্নিশ

২। 'হ' বর্ণ লোপকৃত শব্দ

মূল শব্দ	চলিতে ব্যবহৃত শব্দ
ফলাহার	ফলার
মালদহ	মালদা
বাহান্ন	বায়ান্নো
তেহাত্তর	তিয়াত্তর
পহেলা	পয়লা
বাহিরে	বাইরে
ঠাহর	ঠাওর/ঠাউর
বহি	বই
সহি	সই
কেহ	কেও
চাহনি	চাউনি
গহণা	গয়না
চাহিয়া	চেয়ে
গাহিয়া	গেয়ে
বহিয়া	বয়ে
সহিয়া	সয়ে
শিহরিয়া	শিউরে
কহিয়া	কয়ে
রহিয়া	রয়ে
নাহিয়া	নেয়ে
সিপাহী (ফারসি)	সেপাই
সুরাহী (")	সোরাই
আলাহিদা (")	আলাদা
শাহ্ (")	শা
পর্দাহ্ (")	পর্দা

ঙ) দ্বিমাত্রিকতার প্রভাব (Dimetrism/Bimorism)

৭.৬ বাঙলাভাষীদের আরেকটি প্রবণতা হলো যে কোন শব্দকে দুটি মাত্রায় উচ্চারণ করা। যেমনঃ- 'চ-লো' শব্দটিকে দুটি মাত্রায় উচ্চারণ করা হয়। এখানে 'চ' বর্ণ ও 'লো' বর্ণ উচ্চারণে পৃথকভাবে যতটা সময়ের দৈর্ঘ্য মেনে চলতে হয়, তাকে একেকটি মাত্রা বলে। 'চলো' শব্দটি উচ্চারণে দুটি মাত্রা ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙ্গালী মাত্রেই প্রতিটি শব্দকে উচ্চারণের ক্ষেত্রে এরূপ দু'মাত্রায় ভাগ করে নেবার প্রবণতা বিরাজমান। একে 'দ্বি-মাত্রিকতা' বলে। এই দ্বি-মাত্রিকতা চলিত শব্দ সৃষ্টিতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলে। নিম্নে উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

মূল শব্দ	দ্বি-মাত্রিকতার ফল
রাখিলাম	রাখ্-লাম
চলিলাম	চল্-লাম
বলিবার	বল্-বার
ধরিবার	ধর্-বার
মারিবার	মার্-বার
ভাগিনেয়	ভাগ্-নে
পাগলী	পাগ্-লী
চলিয়া	চ-লে
মারিয়া	মে-রে
আসিয়া	এ-সে
তুলিয়া	তু-লে

৮.০ বাক্য গঠনে সাধু ও চলিত ভাষা

৮.১ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বাঙ্গালীর মধ্যে এত তীব্র হয়েছে যে, সাধু ভাষায় রচিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, প্রতিবেদন, সংবাদ প্রভৃতির অস্তিত্ব এখন প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। কথোপকথন ও ভাষণে বহুদিন থেকেই চলিত ভাষা প্রায় সকল স্থান দখল করে নিয়েছিল; ইদানীং লেখ্য রূপেও চলিত ভাষার প্রচলন প্রায় সর্বত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম জীবনে সাধু ভাষা এবং শেষে চলিত ভাষায় তাঁদের রচনা উপহার দিয়ে গেছেন। সাধু ভাষায় লেখা হ্রাস পাবার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, সাধু ভাষায় দেশি ও বিদেশি শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্র যথেষ্ট সীমিত, বরঞ্চ তৎসম শব্দের আধিক্য প্রবল। অথচ গতিময় লেখার জন্য তদ্ভব,দেশি ও বিদেশি শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন ক্রমাগত বেশি করে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মানব জীবনে ব্যস্ততা এবং যুগ-যন্ত্রণা বর্তমানে অনেক বেশী ক্রিয়াশীল; তাই সাধু ভাষার প্রলম্বিত শব্দাবলী প্রয়োগপূর্বক লেখা অব্যাহত রাখার মত সময় লেখকের ভান্ডারে খুব বেশি আর অবশিষ্ট নেই।

৮.২ গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে সাধু ও চলিতের মধ্যে কোন পার্থক্য বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আর নেই। এখন যে কোন ভাষায় লেখা যায় এবং তা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু একটি প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা উপন্যাসে যুগপৎভাবে সাধু ও চলিত দুটো ভাষার শব্দাবলী ব্যবহার কোনক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়। বৈয়াকরণদের নিকট এটি কেবল ত্রুটিই নয়, বরঞ্চ অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। একে 'গুরুচন্ডালী' বিচ্যুতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাই লেখককে প্রথমেই মনস্থ করে নিতে হবে, তিনি সাধু না কি চলিত ভাষায় লিখবেন। দু'টির মিশ্রণ দূষণীয়, তাই পরিত্যজ্য। কেবল উদ্ধৃতি ও সংলাপের ক্ষেত্র ছাড়া সাধু ও চলিত ভাষার একত্রে মিশ্রণ একটি উঁচু মানের লেখার সৌকর্য বিনষ্ট করে দেয়।

৮.৩ অনেকের ধারণা, চলিত ভাষায় লেখা সহজ ও অনায়াসলব্ধ একটি কাজ, সুতরাং এর জন্য কোন অনুশীলন বা অভিধান পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। এ ধারণার ফলে

চলিত ভাষায় বিস্তর দৃষ্টিকটু সাধু শব্দ এবং অপ্রযোজ্য শব্দবালীর মিশ্রণ ঘটছে। বাঙলা ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সাধু অথবা যথার্থ চলিত ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু চলিত ভাষার প্রচলন আজ প্রায় সর্বত্র, তাই যথার্থ চলিত ভাষা প্রয়োগের নিয়মাবলী ও যথাশব্দ ব্যবহারে সকলকেই তৎপর হতে হবে। স্মর্তব্য, চলিত ভাষায় লিখিত বাক্যের মধ্যে কেবল একটি বেমানান সাধু শব্দ পুরো বাক্যটিকে কলুষিত করে দেয়।

৯.০ চলিত ভাষার প্রয়োগ রীতি

৯.১ চলিত ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে লেখককে ক্রিয়াপদগুলোর প্রতি দৃষ্টি প্রদান করতে হয়। কারণ, সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় আগমন কালে সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন ঘটে ক্রিয়াপদের। ক্রিয়াপদের পরিবর্তিত বানান নির্ভুল করতে হয় এবং কতিপয় ক্রিয়াপদের প্রয়োগে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষের ক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্তনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতে হয়।

যেমন ঃ আমি ভোরে উঠি
তুমি ভোরে ওঠো
সে ভোরে ওঠে

এই বাক্যত্রয়ে 'উঠি' 'ওঠো' ও 'ওঠে' ক্রিয়াপদ লক্ষণীয়। তেমনি, আমি ফুল তুলি, তুমি ফুল তোল (তোলো), সে ফুল তোলে; এরূপ বাক্যে 'তোলা' ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সাবধানে না করলে 'সে ফুল তুলে' এরূপ অসমাপিকা ক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। শুনা, ঘুরা, ডুবা, ঝুলা, ছুটা, বুঝা, উড়া, দুলা, প্রভৃতি ক্রিয়াপদে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৯.২ কিছু কিছু ক্রিয়া পদে আরও জটিলতা দেখা দেয়। যেমনঃ সে কোন কিছু চাইতে পারে না' বাক্যটিকে অনেকে লেখেন 'সে কোন কিছু চেতে পারেনা'। 'চেতে' শব্দটি ক্রিয়া পদের সঠিক রূপান্তর হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে লেখকের সজাগ দৃষ্টি না থাকায় এরূপ বিভ্রম ঘটে। চাইতে, নাইতে, গাইতে, গাইলে এই চারটি ক্রিয়াপদকে তাদের নিজরূপেই প্রকাশ করতে হবে। চেতে, নেতে, গেতে, গেলে, এরূপ চলিত শব্দ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অশুদ্ধ রূপ বলে বিবেচিত। (ডঃ সুনীতি কুমার দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৪৩)

৯.৩ কয়েকটি ক্রিয়া পদের সাধু ও চলিত রূপ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ	সাধুরূপ	চলিত রূপ
হইতেছে	হচ্ছে	দেওয়া	দেয়া
করিয়াছিল	করেছিল	নেওয়া	নেয়া
শুইয়াছিল	শুয়েছিল	গাহিয়াছে	গেয়েছে
কাটিয়াছে	কেটেছে	পাইবে	পাবে
লেখিবার	লিখবার	দেখিয়াছিল	দেখেছিল
লেখিয়াছি	লিখেছি	জানাইয়াছেন	জানিয়েছেন
শুনিয়া	শুনে	পৌঁছিয়াছেন	পৌঁচেছেন
শুনা	শোনা	পড়াইতেছে	পড়াচ্ছে

গুনা	গোনা	ছুটাছুটি করা	ছোটাছুটি করা
চাহিয়াছে	চেয়েছে	সাজাইয়াছে	সাজিয়েছে
তুলা	তোলা		
হইবে	হবে		
গিয়াছিল	গিয়েছিল		

(বিঃ দ্রঃ 'দেওয়া,' 'নেওয়া' ক্রিয়া দুটিকে অনেকে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতি)

৯.৪ ক্রিয়াপদের পরে লেখককে সর্বনাম পদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, চলিত ভাষা প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি ভুল ধরা পড়ে সর্বনাম পদে। চলিত ভাষায় লিখিত অনেক বিজ্ঞপ্তির শেষে লেখা থাকে "ইহা সকলের অবগতির জন্য জারি করা হলো।" এ বাক্যে 'ইহা' সর্বনামের ব্যবহার পুরো বিজ্ঞপ্তিটিকেই মলিন করে ফেলে। এরূপ ক্ষেত্রে বাক্যটিকে একটু ঘুরিয়ে এভাবে লেখা সমীচীন হবে, "সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হলো।" সর্বনাম পদের ইহা, উহা, তাহা, ইহাই, উহাই, তাহাই, যাহাই, প্রভৃতি শব্দাবলী চলিত ভাষায় ব্যবহার করা কোনক্রমেই গ্রাহ্য নয়। এক্ষেত্রে এটা, সেটা, এটি, সেটি, তা, তাই, এটিই, সেটিই,তাই (ই), যাই, প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে অথবা বাক্যটিকে কিঞ্চিৎ পাল্টিয়ে প্রণয়ন করতে হবে।

এখানে কয়েকটি সর্বনাম পদের চলিত রূপ দেখানো হলো ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ
তাহারা	তারা
তাহাদের	তাদের
তাহাকে	তাকে
ইহারা	এরা
ইহাদিগকে	এদেরকে
এই	এ (তবে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য 'এই' ব্যবহৃত হতে পারে)
কাহাদের	কাদের
ইহাতে	এতে
ইহা	এ/এই/এটা/এটি
উহা	তা/সেটা/সেটি
উহাতে	ওতে
কাহাকেও	কাউকেই
যাহারা	যারা
বালকগুলি	বালকেরা/বালকগুলো (পশ্চিমবঙ্গে 'বালকগুলি' শব্দটি গ্রাহ্য)

৯.৫ বাক্যস্থিত বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে যথা সম্ভব তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে দেশি ও বিদেশি শব্দও ব্যবহার করা যায়। রাত্রি, বৈকাল, সন্ধ্যা, অদ্য, হিংসা, চক্ষু, চন্দ্র, প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে রাত, বিকেল, সন্ধ্যে, আজ, হিংসে, চোখ, চাঁদ, প্রভৃতির ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এমনকি স্থানের নামের ক্ষেত্রেও চলিত শব্দ থাকলে তা প্রয়োগ করতে হবে। যেমনঃ 'যশোহর' এর স্থলে 'যশোর',

গুনা	গোনা	ছুটাছুটি করা	ছোটাছুটি করা
চাহিয়াছে	চেয়েছে	সাজাইয়াছে	সাজিয়েছে
তুলা	তোলা		
হইবে	হবে		
গিয়াছিল	গিয়েছিল		

(বিঃ দ্রঃ 'দেওয়া,' 'নেওয়া' ক্রিয়া দুটিকে অনেকে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতি)

৯.৪ ক্রিয়াপদের পরে লেখককে সর্বনাম পদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, চলিত ভাষা প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি ভুল ধরা পড়ে সর্বনাম পদে। চলিত ভাষায় লিখিত অনেক বিজ্ঞপ্তির শেষে লেখা থাকে "ইহা সকলের অবগতির জন্য জারি করা হলো।" এ বাক্যে 'ইহা' সর্বনামের ব্যবহার পুরো বিজ্ঞপ্তিটিকেই মলিন করে ফেলে। এরূপ ক্ষেত্রে বাক্যটিকে একটু ঘুরিয়ে এভাবে লেখা সমীচীন হবে, "সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হলো।" সর্বনাম পদের ইহা, উহা, তাহা, ইহাই, উহাই, তাহাই, যাহাই, প্রভৃতি শব্দাবলী চলিত ভাষায় ব্যবহার করা কোনক্রমেই গ্রাহ্য নয়। এক্ষেত্রে এটা, সেটা, এটি, সেটি, তা, তাই, এটিই, সেটিই,তাই (ই), যাই, প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে অথবা বাক্যটিকে কিঞ্চিৎ পাল্টিয়ে প্রণয়ন করতে হবে।

এখানে কয়েকটি সর্বনাম পদের চলিত রূপ দেখানো হলো ঃ

<u>সাধুরূপ</u>	<u>চলিত রূপ</u>
তাহারা	তারা
তাহাদের	তাদের
তাহাকে	তাকে
ইহারা	এরা
ইহাদিগকে	এদেরকে
এই	এ (তবে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য 'এই' ব্যবহৃত হতে পারে)
কাহাদের	কাদের
ইহাতে	এতে
ইহা	এ/এই/এটা/এটি
উহা	তা/সেটা/সেটি
উহাতে	ওতে
কাহাকেও	কাউকেই
যাহারা	যারা
বালকগুলি	বালকেরা/বালকগুলো (পশ্চিমবঙ্গে 'বালকগুলি' শব্দটি গ্রাহ্য)

৯.৫ বাক্যস্থিত বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে যথা সম্ভব তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে দেশি ও বিদেশি শব্দও ব্যবহার করা যায়। রাত্রি, বৈকাল, সন্ধ্যা, অদ্য, হিংসা, চক্ষু, চন্দ্র, প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে রাত, বিকেল, সন্ধ্যে, আজ, হিংসে, চোখ, চাঁদ, প্রভৃতির ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এমনকি স্থানের নামের ক্ষেত্রেও চলিত শব্দ থাকলে তা প্রয়োগ করতে হবে। যেমনঃ 'যশোহর' এর স্থলে 'যশোর',

'মালদহ' এর স্থলে 'মালদা' প্রভৃতি। উল্লেখ্য, পশ্চিম বঙ্গের অনেক লেখক ও সাহিত্যিক 'সন্ধ্যা' শব্দটিকে চলিতে অপরিবর্তনীয় রাখার পক্ষপাতি।

এখানে কয়েকটি বিশেষ্য পদের সাধু ও চলিত রূপ বর্ণিত হলো ঃ

সাধু রূপ	চলিত রূপ
বিবাহ্	বিয়ে
ভিতর	ভেতর
অভ্যাস	অভ্যেস
দিবারাত্রি	দিনরাত
তুলা	তুলো
বানর (বান্দর)	বাঁদর
ভ্রাতা/ভগ্নী	ভাই/বোন
রওয়ানা	রওনা ('রওয়ানা' শব্দটিও চলিতে ব্যবহারযোগ্য)
জুতা	জুতো
সূতা	সুতো
ঔষধ	ওষুধ
উঠান	উঠোন
খেলাধূলা	খেলাধুলো ('খেলাধুলা' বানানটিও গ্রাহ্য)
বৎসর	বছর
জানালা	জান্‌লা
ভিটামাটি	ভিটেমাটি
ভিখারী	ভিখিরি
ক্ষুধা	খিদে

৯.৬ চলিত ভাষায় বিশেষণ পদগুলোও পরিবর্তনে পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে অভিশ্রুতির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষণ পদ চলিত ভাষায় ব্যবহার্য। সেই সংগে দেশি ও বিদেশি বিশেষণ পদ চলিতে ব্যবহার করতে হয়। স্মরণীয়, তৎসম শব্দের বিশেষণ পদগুলো অত্যন্ত প্রলম্বিত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। চলিত ভাষায় সেগুলো অনেক সময় খাপছাড়া ঠেকে। তাই সহজ ও সাবলীল বিশেষণ পদ সংযুক্ত করতে হবে। যেমন, মন্থর, অগ্রে, উচ্চ-নিম্ন, ভগ্ন, ক্রোড়পতি, প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে ধীর, আগে, উঁচু-নিচু, ভাঙ্গা, কোটিপতি, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

এখানে কয়েকটি বিশেষণ পদের উদাহরণ প্রদত্ত হলো ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ
মিথ্যাবাদী	মিথ্যেবাদী
চাকুরীজীবী	চাকরিজীবী/চাকুরে
পহেলা	পয়লা
নূতন	নতুন
আদ্যপ্রান্ত	আগাগোড়া
আমোদপ্রিয়	আমুদে
আগামী	আসছে
গ্রাম্য	গেঁয়ো
তদ্রূপ	সেরূপ

এতদর্থে	এজন্য/এ অর্থে
পুরাতন	পুরোনো
লাগসহি (Appropriate)	লাগসই
বৃদ্ধ	বুড়ো
বিলাতী	বিলিতি/বিলেতি
অন্ধকারাচ্ছন্ন	আঁধারময়
হিসাবী	হিসেবি
অলস	আলসে
আদরের/আদরপ্রিয়	আদুরে
শহরের/শহরবাসী	শহুরে
পূর্ণ/সম্পূর্ণ	পুরো/পুরোপুরি

৯.৭ অনেকের ধারণা 'অব্যয়' পদগুলো যেহেতু ব্যাকরণ অনুসারে "যার কোন ব্যয় বা পরিবর্তন নেই, তাই অব্যয় পদ", তাই এগুলো চলিত ভাষায় তৎসম রূপেই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বাস্তবে অব্যয় পদ ব্যয় বা পরিবর্তনহীন হলেও চলিত শব্দে তার রূপ পরিবর্তন সুস্পষ্ট। সুতরাং অব্যয় পদের চলিত রূপই চলিত ভাষায় ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য এক্ষণে, উপরন্তু, অধিকন্তু, প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে এখন, এ ছাড়া/এ ছাড়াও, তা ছাড়াও, প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখানে সচরাচর ভ্রান্তিযোগ্য কয়েকটি অব্যয় পদের চলিত রূপ দেখানো হলো ঃ

সাধু রূপ	**চলিত রূপ**
যদ্যপি	যদিও
এযাবৎ	এখন পর্যন্ত
আদপে	আদৌ
ঈষৎ	কিঞ্চিৎ/কিছুটা
অবধি	থেকে/হতে/পর্যন্ত
সহসা	হঠাৎ/সে সময়ে
কদাচিৎ	কালে ভদ্রে/কখনও কখনও

১০.০ উপসংহার

চলিত ভাষার ব্যাপক প্রচলন বাঙলা ভাষাকে গতিশীল ও সহজবোধ্য করে তুলেছে। এতে ভাষার প্রসার দ্রুততর ও ব্যাপকতর হবে। সাধারণের মনের কথাগুলো সহজভাবে প্রকাশের জন্য এর অবারিত বিচরণক্ষেত্র নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসচেতনতা ও যথাশব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অলসতাজনিত বিচ্যুতি এর গুণগত মান খর্ব করে দিচ্ছে। প্রায়শ গুরু-চন্ডালীর অবাধ রাজত্ব কায়েমের সীমাহীন তৎপরতা 'চলিত ভাষা'র শ্বেতবস্ত্রকে মলিন করে চলেছে। শুধু প্রসারের ব্যাপকতা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করে না। গুণগত মানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাধনা ও অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, যা এ মুহূর্তে দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রয়াস যদি কাম্য হয়, এর যথার্থতা ও বিশুদ্ধরূপও কাম্য হওয়া উচিৎ। তার জন্য অনুশীলন, অধ্যবসায় ও মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের ভাষা শিক্ষা মডিউলের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আজাদ, হুমায়ুন, সম্পাঃ (১৯৯৪) *মুহম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। আজাদ, হুমায়ুন, সম্পাঃ, (১৯৮৫) *বাঙলা ভাষা (২য় খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। আজাদ, হুমায়ুন (১৯৮৮) *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৪। ডঃ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, (১৯৮৯) *ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, রূপা এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

৫। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, সম্পাঃ, (১৯৯৩) *বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৬। ডঃ চৌধুরী, আবুল কাশেম (১৯৮৫) *উচ্চতর ব্যবহারিক ভাষা ও রচনা*, তরুণ লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৭। চৌধুরী, জামিল (১৯৯৩) *বানান ও উচ্চারণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮। জামান, আনিসুজ, (১৯৮৪) *পুরোনো বাংলা গদ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯। পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমী, (১৯৮৬) *প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা*, কলকাতা।

১০। বিশ্বাস, নরেন, (১৩৯৪) *বাঙলা উচ্চারণের সংক্ষিপ্ত সূত্রাবলী* ,বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১। রহিম, আব্দুর (১৩৮২) *সোনার বাঙলা অভিধান*, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১২। লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন ও অন্যান্য, সম্পাঃ, (১৯৮৮) *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩। সেন, সুকুমার, (১৯৭৫) *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা

১৪। হক, মহাম্মদ দানীউল, (১৯৯৪) *ভাষা বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।